" আমি আগন্তুক আমি বার্ত্তা দিলাম .."

বাংলা গানের ক্ষেত্রে আজ যদিও আমার নামের সাথে অনেকেই অতি প্রশংসাই বহু বিশেষণের পর বিশেষণ লাগিয়ে আমার গানের মূল্যায়ন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু বাংলা গান গাওয়ার শুরুর পর্যায়ে এমন একটা সময়ও একদিন ছিল যখন কলকাতায় গায়ক হিসেবে আমার অবস্থাটা, বাংলা সাহিত্যিক হিসেবে নীরদ সি চৌধুরীর অবস্থার চেয়েও বোধহয় খারাপ ছিল। কোন ছবিতে আমাকে দিয়ে গান গাওয়ানোর প্রসঙ্গ এলে বা কেউ একজন আমার কন্ঠের , আমার হিন্দীগানের প্রশংসা করলেও প্রায় সকলেই তখন সমস্বরে বলে উঠতেন ,-" মান্না দে আবার কী এমন গায় ! সংগীতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্রদের ভাইপো বলেই কি ওর গানেরও প্রশংসা করতে হবে ! " কলকাতার প্রায় সকলের মধ্যেই , এমনকি নিরপেক্ষ সংগীত সমালোচকদের মধ্যেও তখন আমার সম্পর্কে এরকম একটা বিরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল যে ,-" মান্না দে! উনি তো মশাই বোম্বেটে লোক। উনি আবার বাংলা গানের কি বোঝেন!" প্রথম প্রথম এসব ব্যাপার গুলোতে যে , মনে মনে একেবারেই কোন আঘাত পাইনি , তা হয়তো নয়। কিন্তু ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যাপারগুলোই একদিন আমারও খুবই গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। কারণ,বম্বের রূঢ় অভিজ্ঞতা থেকে আমার মধ্যে ততদিনে সেই রিয়েলাইজেশনটা এসে গিয়েছিল যে,কারো জীবনেই সাফল্য কোনদিনই এত সহজে এসে যায় না ; প্রতিভা এবং উদ্যোগের প্রাশাপাশি সাফল্যের সবচেয়ে বড় factor ই হচ্ছে যোগাযোগ। তা সে হলিউড ,বলিউড বা টলিউড যেখানেই হোক যোগাযোগের জন্য শিল্পীকে অপেক্ষা করতেই হয়। বিশেষত বম্বের মতো ওরকম বিস্তৃত গান-বাজনার পরিধিতেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে যেভাবে আমাকে দিনের পর দিন মাটি কামড়ে লড়াই চালাতে হয়েছে , সেক্ষেত্রে কলকাতার মতো এত সীমিত একটা গান-বাজনার field এ হঠাৎ হঠাৎ এক-দুবার বম্বে থেকে উড়ে এসে তা' বড়-তা'বড় সুপ্রতিষ্ঠিত Calcutta based শিল্পীদের মাঝে স্থান করে নেয়াটা যে এত সহজ কম্ম নয় , এই অপ্রিয় সত্যটাও সেদিন খুব rationally-ই আমি মেনে নিয়েছিলাম। উপরন্তু আমাদের মতো লঘু সংগীতের শিল্পীদের ব্যাপক প্রচার তথা প্রতিষ্ঠার যেটা মূল চাবিকাঠি অর্থাৎ

Deba Prasad Das

সিনেমায় কোন hero র লিপে প্লে-ব্যাক করা , কলকাতায় practically সেই সুযোগটাই ছিল খুবই সংকীর্ণ। কারণ টালিগঞ্জ তখন ছিল এককথায় one hero industry। সৌমিত্রবাবু বা ঐরকমই বড় মাপের আরো দু-একজন হিরোও তখন টালিগঞ্জে থাকলেও ঠিক matinee-idol বলতেই তখনকার দিনের বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েদের মনে নিমেষেই যে মুখটা ভেসে উঠত , মেয়েরা যাকে নিয়ে দিবা স্বপ্ন দেখতো, ছেলেরা যার অনুকরণে টেরি কাটত , কথা বলতো, মানে এককথায় যিনি হয়ে উঠেছিলেন বাঙ্গালী চিত্তের রোমান্টিকতার সার্থক উদাহরণ, অবিসংবাদিত ভাবে তিনি ছিলেন - মহানায়ক উত্তমকুমার। এবং মহানায়কের লিপে আর এক মহাগায়ক হেমন্ত মুখার্জীর গান সেদিন যত জনপ্রিয় হয়েছিল, লোকে হেমন্ত মুখার্জী ও উত্তমকুমারকে যেভাবে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ বলে তখন ভাবতেন , সেই জুটি crazeটা ভেঙ্গে উত্তমবাবুর লিপে আমাকে দিয়ে গান গাওয়ানোর কথা তখন কেউ কল্পনাও করতে পারতেন না এবং সেই প্রেক্ষাপটে এই না পারাটাই ছিল খুবই স্বাভাবিক। কারণ film industry এমনই একটা industry , মানে এমনই একটা ব্যবসা, যেখানে নায়ক-নায়িকা জুটি , নায়ক-গায়ক জুটি , নায়িকা-গায়িকা জুটি এ সমস্ত ব্যাপার গুলোর প্রতি প্রযোজক, পরিচালক, দর্শক সবারই সর্বত্রই এমন একধরণের দুর্বলতা থাকে , একধরণের craze থাকে , যে crazeটাকে ভেঙ্গে নতুন কিছু ক'রে আর্থিক লাভের ক্ষেত্রে risk নিতে খুব কম পবিচালক বা প্রযোজকই সাহস করে থাকন। যেহেতু সিনেমা একটি পণ্য , তাই লাভ - লোকসানের দৃষ্টিকোণ থেকে বম্বে-কলকাতা-মাদ্রাজ সর্বত্রই জুটি craze এর সেই একই ফর্মূলা, একই ফলশ্রুতি হতে বাধ্য। কিন্তু সেই চিরাচরিত ফর্মূলা ভেঙ্গে বম্বেতে শঙ্কর-জয়কিষেন যেমন আমাকে দিয়ে গাইয়ে prove করে দিয়েছিলেন যে,বাজার কাটতি জুটি craze টাই শিল্পের মানদণ্ডে শেষ কথা নয় , তেমনি কলকাতায় হেমন্ত উত্তম জুটি প্রথা ভেঙ্গে উত্তমবাবুর লিপে আমাকে দিয়ে গান গাওয়ানোর ক্ষেত্রে সুধীন দাশগুপ্তের কাছে আমি বিশেষ ভাবেই ঋণী।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সরোজবাবু যখন 'শঙ্খবেলা' ছবিটি তৈরী করেন , তখন ছবির সংগীত পরিচালক বন্ধুবর সুধীন দাশগুপ্ত একদিন এসে আমায় বল্লেন ,- " মান্না দা , দুটো খুব ভালো গান বানিয়েছি , উত্তমকুমারের লিপে এই গান দুটো এবার আপনাকেই গাইতে হবে।" সুধীনবাবুর কথা শুনে আমি তো একেবারে অবাক। বল্লাম -"সে কি ! " উনি বল্লেন ,-" হ্যাঁ মান্নাদা, এবার একটু অন্য রকমের গান , একটু western ধরনের গান বানিয়েছি। এগান আপনাকেই গাইতে হবে।" উত্তমকুমারের লিপে এই প্রথম গান গাওয়ার offer পেয়ে আমি তো তখন ভীষণ excited , এককথায় রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু ক'দিন পরেই লোকমুখে হঠাৎ কানাঘুষোয় শুনলাম যে, আমাকে দিয়ে নাকি ঐ গান দুটো গাওয়ানো হবে না। অনেক ডিস্ট্রিবিউটররাই নাকি বলছেন যে -" মান্না

দে গাইবেন ! আরে ধূর ধূর ! না না ওসব না। ওসব করলে film চলবে না।" এমন কি ডিস্ট্রিবিউটরদের ওরকম কথাবার্তা শুনে টুনে উত্তমবাবু নিজেও নাকি ছবি ফ্লপ হবার আশঙ্কায় আমাকে দিয়ে গান গায়োনোর ব্যাপারে তখন খুবই দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। সত্যি বলতে কি পরিস্থিতির চাপে পড়ে গানগুলো কিশোরকুমারকে দিয়ে গাওয়ানোর কথাবার্ত্তাও নাকি সে সময় মোটামুটি প্রায় পাকাই হয়ে গিয়েছিল। লোকমুখে এমনতর কথাবার্ত্তা শুনে টুনে আমারও তখন মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। এতদিন পর যা-ও উত্তমবাবুর লিপে গান গাওয়ার একটা সুযোগ এলো , তা-ও কিনা জুটি craze এর ভয়ে শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যাবার মুখে ! কিন্তু না , এ ব্যাপারে আমি কোন বাদ-প্রতিবাদ না করলেও সুধীনবাবু একাই সেদিন আশঙ্কাবাদীদের বিরুদ্ধে যেভাবে counter logic দিয়েছিলেন, যেভাবে আমাকে দিয়ে উত্তমবাবুর লিপে গান গাওয়াতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন , তাতে ওঁরই শেষপর্যন্ত জিত্ হল, মানে শেষপর্যন্ত ঐ ঠিক হল যে, গান দুটো ছবিতে উনি আমাকে দিয়েই গাওয়াবেন। এবং সত্যি সত্যিই একদিন গাওয়ালেনও সেই গান -" আমি আগুন্তুক আমি বার্ত্তা দিলাম ...."ও "কে প্রথম কাছে এসেছি, কে প্রথম চেয়ে দেখেছি , কিছুতেই পাই না ভেবে, কে প্রথম ভালো বেসেছি ,- তুমি না আমি ?? "-দীর্ঘ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা হলেও এই উল্লেখনীয় গানদুটোর বেড়ে ওঠার সমস্ত ঘটনাই যেন ছবির মতো আজও আমার মনে জলজ্যান্ত । এই গানদুটো রেকর্ড তো হয়েছিল বম্বের মেহেবুব স্টুডিওতে। আমার মনে আছে, গানদুটো রেকর্ড করতেও ঘটনাচক্রে সেদিন কী ঝামেলাটাই না হয়েছিল ! কিছুতেই recording এর date পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেক কষ্টে যখন একদিন date পাওয়া গেল, তো সেদিন লতার শরীর খারাপ হয়ে গেল। যখন লতাজীর শরীর ভালো হ'ল,তো তখন আবার studio র problem . এরকম যখন অবস্থা,তখন মেহেবুব স্টুডিওর রেকর্ডিস্ট কৌশিক সাহা আমায় বল্লেন যে,"মান্না , জাকর নৌশাদ সাহাবসে পুছো। কাল উনকি recording হ্যায়। ঔর ওহি এক আদমি হ্যাঁয় , বহুৎ হমদর্দি হ্যাঁয়। তুম উনসে একবার পুছো। শায়েদ কাম বন যায়েগা।"-আমি সঙ্গে সঙ্গেই গেলাম নৌশাদ সাহেবের কাছে। বল্লাম।উনি বল্লেন যে "মান্না সাহাব, এগার বারা বাজেতক অগর আপ complete কর সক্তে হ্যাঁয় , তো কর লিজিয়ে। নেহিতো মেরা ভি লম্বা-চওড়া গানা হ্যায়, জরা মুশ্কিল পড় যায়েগা।" আমি তাতেই রাজী হয়ে গেলাম এবং ওখান থেকে সোজা চলে গেলাম লতাজীর কাছে। বল্লাম -"কাল সুবহ সাত বাজে recording হ্যায়। আপ আ যাইয়ে জরুর।"উনি বল্লেন - "ঠিক হ্যায় , চলিয়ে কর দেঁতে।" এরপর সেই সব মিউজিশিয়ান যারা বাজিয়েছিলেন, সেই মনোহারী , কেসি , বাসু ইত্যাদি সকলকে আমি এবং সুধীনবাবু নিজে বাড়ী বাড়ী গিয়ে বলে এসেছিলাম পরের দিনের রেকর্ডিং এর কথা। এই করে করে পরদিন যখন সত্যি সত্যিই প্রথম গানটা নামলো , ঘড়িতে তখন সকাল

আটটা বেজে তিরিশ মিনিট। উত্তমকুমারের লিপে আমার গাওয়া প্রথম গানের গড়ে ওঠার এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত । বাংলা গানের ক্ষেত্রে সেই - " আমি আগন্তুক আমি বার্তা দিলাম " গানই সেদিন আমার জীবনেও নতুন বার্তা নিয়ে এসেছিল। এরপর আর কোনদিনই ক্ষণিকের জন্যও তেমনভাবে আমাকে পেছনের দিকে ফিরে তাকাতে হয়নি। পরবর্ত্তী সময়ে বিভিন্ন সুরকারের সুরে অন্য হিরোদের লিপে তো বটেই , এমনকি একমাত্র উত্তমকুমারের লিপেই বোধ হয় নেই নেই করেও প্রায় শ' খানেক ছবিতে অন্তত শ'তিন-চারেক গান আমি গেয়েছি। কিন্তু প্রচলিত জুটি প্রথা ভেঙ্গে সুধীনবাবু সেদিন আমাকে যে break টা দিয়েছিলেন , সেটা আক্ষরিক অর্থেই priceless, সে'টা কোনদিনই আমি repay করতে পারবো না।

সুধীন দাসগুপ্তের সাথে আমার পরিচয় সে প্রায় পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ওঁর সুরে ' ডাকহরকরা ' ছবিতে গান গাইবার সময় থেকে। " ডাক হরকরা "তে আমাকে দিয়ে সুধীনবাবু তখন " লাল পাগড়ি বেঁধে মাথে " , 'মনরে আমার হায় শুনলি না'এরকম অনেকগুলো ভালো ভালো গান গাইয়েছিলেন। খুবই ভালো লেগেছিল ওঁর সুরকরার পদ্ধতি দেখে। আমাদের বাংলাদেশে সেই যে নামতা পড়ার মতো সুরকরার এক ধরনের চিরাচরিত প্রথা চলে আসছিল , তাঁর থেকে deviate করে একটু ওয়েষ্টার্ন নোটস্ , একটু বীটস্ , একটু কর্ডস ব্যবহার করে কিভাবে একটু অন্যরকমের সুর করা যায় , প্রথম থেকেই সুধীনবাবুর মধ্যে এরকম একটা খোঁজ ছিল। এবং সেই জিনিষগুলো বাংলাগানের মধ্যে উনি খুব meaningfully ধীরে ধীরে introduceও করতে পেরেছিলেন । " তিন ভুবনের পারে" র - ' হয়তো তোমারই জন্য হয়েছি প্রেমে যে বন্য " থেকে শুরু করে ' এই পথে পাশাপাশি চলতে পারি , সব কথা তোমায় আমি বলতে পারি ' ইত্যাদি সমস্ত গানেই তার সেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সহজেই লক্ষ করা যাবে। শুধু ফিল্মী গানই নয় , ঐ পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকেই সেই যে - "মেঘলা মেয়ে মেঘেরই সাজ পড়েছে', 'একই অঙ্গে এত রূপ দেখিনি তো আগে,' 'এক ঝাঁক পাখীদের মতো কিছু রোদ্দুর 'ইত্যাদি বেসিক বাংলা গান আমাকে দিয়ে উনি একটু একটু করে গাওয়াতে আরম্ভ করেছিলেন,সেসব গানেও তাঁর ঐ creativity টা আমায় খুবই impress করেছিল সে সময়। তবে , আমার বাংলা গান গাওয়ার শুরুর পর্যায় সম্পর্কে বলতে গেলে একটা কথা বিশেষভাবেই বলতেই হবে যে বসন্ত দেশাই , সলিল চৌধুরী প্রমুখ বিখ্যাত সুরকারদের সুরে চল্লিশ দশকের শেষ থেকে ষাটের দশকের প্রথমার্ধের মধ্যেই আমি যদিও ' অমর ভূপালি ", "গৃহ প্রবেশ ", "একদিন রাত্রে ","গঙ্গা","মুখুজ্জে পরিবার" এরকম বেশ কিছু ছবিতে গান গেয়ে বাংলা চিত্রগীতির শ্রোতাদের কাছে অল্প-বিস্তর পরিচিতি পেয়ে গিয়েছিলাম , কিন্তু 'শঙ্খবেলা' ছবিতে উত্তমকুমারের লিপে আমাকে দিয়ে প্রথম গান গাইয়ে

সুধীনবাবু সেদিন আমাকে যে ব্রেকটা দিয়েছিলেন, আমার বাংলা গানের জীবনে তাঁর সেই অবদান এককথায় অবিস্মরণীয়।পরবর্তীতেও ওঁর সুরে বহু ছবিতেই আমি বহু ভালো ভালো গান হয়তো গেয়েছি, কিন্তু "কে প্রথম কাছে এসেছি" র মতো রোমান্টিক বাংলা ডুয়েট যেমন সারা জীবনেও খুব বেশী একটা আমি গাইনি, তেমনি 'ডাক হরকরা 'ছবিতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "ওগো তোমার শেষ বিচারের আশায় আশায় বসে আছি" গানটি গাইতে গিয়ে গানের হৃদয়দ্রাবি অনুভবের সাথে সুধীনবাবুর ওরকম যথার্থ সুরারোপে যেভাবে সেদিন কথায়-সুরে দ্রাবিত হয়ে গিয়েছিলাম, সে রকমটাও হয়তো সারা জীবনে খুব বেশী আমি হতে পারিনি। আসলে ওগুলো শুধুই কথার পিঠে কথা জুড়ে বাজার কাটতি সংগীত নামধারী সুর আর কথার এলোপাথাড়ি পথ চলাই নয়, একটা চলমান জীবন দর্শন যেন। আজ জীবনের এই অপরাহ্নবেলায় এই গানটা গাইতে গেলেই হঠাৎই মনটা কেমন যেন হয়ে যায়, তিন -চারটে লাইন গাওয়ার পরই গলাটা কেমন যেন একটা ডুকরে ওঠা কান্নায় বুজে আসতে চায়। জীবনের শেষদিকে কাকা মাঝে মাঝেই এ গানটা খুবই শুনতে চাইতেন। শুনেছি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও নাকি মৃত্যুর আগে তার নিজেরই লেখা একমাত্র এই গানটাই বারবার শুনতে চেয়েছিলেন। তবে, এই গানের কোন প্রসঙ্গ এলেই আমার বাংলা গানের সারাজীবনের অবিচ্ছেদ্য অন্তরঙ্গ সাথী রাধুবাবু মানে রাধাকান্ত নন্দীর কথাটাই সবচেয়ে বেশী করে আজ মনে হয়। এই গানটা গাইলেই কেন জানি না ওঁর মধ্যে একটা কান্নার উদ্রেক হ'ত। তবলা বাজাতে বাজাতেই ধরা ধরা গলায় বলত - '..... গায়েন না মান্নাদা, গায়েন না এই গানটা। এই গানটা শুনলেই আমার ভিতরটায় ক্যামন যেন কইরা উঠে, মান্না দা। আমি নিজেরে তখন আর ঠিক যেন সামলাইতে পারিনা.... ।" দেখতাম বলতে বলতেই রুমাল দিয়ে ওঁ চোখ মছছে। আজ রাধুবাবু পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে আমাদের থেকে অনেক অনেক দূরে চলে গেছেন,কিন্তু আজও যখনই এই গানটা আমি গাই, রাধুবাবুর কান্না ভেজা কথাগুলো যেন স্পষ্ট কানে এসে বাজে, যেন আজও স্পষ্ট শুনতে পাই, -" ..গায়েন না মান্নাদা, গায়েন না আর এই গানটা। মনের ভেতরটায় ক্যামন যেন করে......।'

উত্তমকুমারের লিপে আমার গান যে মোটেও বেমানান নয় এবং উত্তমকুমারের লিপে হেমন্তবাবুর পরিবর্তে আমাকে দিয়ে গাওয়ালে যে দর্শকের দরবারে সে ছবি মোটেও মার খাবে না বরং উল্টো,ছবির বাণিজ্যিক সাফল্যের পেছনে আমার গানও যে একটা বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে,"শঙ্খবেলা"র 'আমি আগন্তুক আমি বার্ত্তা দিলাম' ইত্যাদি গানের মধ্য দিয়েই বস্তুত টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ায় সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে। প্রযোজক,পরিচালক থেকে শুরু করে গীতিকার, সংগীতকার তথা উত্তমবাবু নিজেও মূলত তখন থেকেই ছবিতে আমাকে দিয়ে গান গাওয়ানোর ব্যাপারটা একটা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শুরু

করেছিলেন। এবং এরই ফলশ্রুতিতেই আমি সুযোগ পেয়েছিলাম উত্তমবাবুর লিপে একের পর এক ছবিতে গান গেয়ে বাংলার সংগীত জগতে আমার আজকের যা কিছু প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতির ভীতটা গড়ে তুলতে। আমার মনে আছে ,যে বছর ''শঙ্খবেলা'' মুক্তি পেলো, সে বছরই মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানেই আবার উত্তমকুমারের লিপে গান গেয়ে বাংলা গানের জগতে নিজের অস্তিত্বকে জোড়ালো করবার একটা অমূল্য সুযোগ আমি পেয়ে গিয়েছিলাম। ছবির নাম ,- '' এন্টনী ফিরিঙ্গী''। সংগীত পরিচালক - অনিল বাগচী।

কলকাতার সুরকারদের মধ্যে অনিলদার সুর করার পদ্ধতিটাও আমার বরাবরই খুব ভালো লাগতো। যদিও তাঁর সুরের আধারটা বরাবরই হ'ত আমাদের শাস্ত্রীয় সংগীত ,কিন্তু রাগকে ভিত্তি করেও তাতে আধুনিকতার টাচ দিয়ে বাণিজ্যিক ফিল্মী সংগীতের সুরারোপে ওঁর যে মুন্সিয়ানা,বাংলার সাংগীতিক আবহাওয়ার সাথে সুরকে একীভূত করার যে একটা নজরকাড়া বৈশিষ্ট্য, তারই জ্বলন্ত নিদর্শন পেয়েছিলাম'এন্টনী ফিরিঙ্গী ' ছবিতে ম্যাটিনী আইডল মহানায়কের মুখে আভোগী কানাড়াভিত্তিক গান '' চম্পা চামেলী গোলাপেরই বাগে......'' বা '' আমি যামিনী তুমি শশী হে ....'' র মতো আধুনিক রাগপ্রধান গানের ঐ রকম জনপ্রিয়তা দেখে। ঐ ছবিতেই অনিলদা আমাকে দিয়ে আরও অন্তত গোটা তিনেক গান গাইয়ে ছিলেন , যার মধ্যে ''আমি যে জলসা ঘরে'' গানটাতো একেবারে রৌপ্যজয়ন্তীবর্ষ পেরিয়ে আজকের এই সুরের ডামাডোলের আবহাওয়াতেও বাঙ্গালী শ্রোতাদের কাছে আজও সেদিনের মতোই যেন সমান জনপ্রিয়। আজকের যুগে যখন একটা ছবি 'হল' থেকে উঠে যাবার ক' দিনের মধ্যেই সে ছবির জনপ্রিয়তম গানটিও শ্রোতার মন থেকে অনায়াসে উঠে যাচ্ছে , সেই প্রেক্ষাপটে একটা রাগভিত্তিক ফিল্মীগানকে এরকম কালোত্তীর্ণ করে তুলতে একজন সংগীত পরিচালকের কি পরিমান ব্যুৎপত্তি, কি পরিমান মুন্সিয়ানা থাকা দরকার, ভাবলে অবাক হয়ে যাই।

এন্টনী ফিরিঙ্গীর ওরকম সাফল্যের পর 'মা ও মাটি', ' শেষ পর্ব ', 'কবি' এরকম আরও বেশ কিছু ছবিতেও আমাকে দিয়ে উনি তখন গান করিয়েছিলেন। হয়তো এর কোন গান জনপ্রিয় হয়েছে , হয়তো কোনটা বাজারে তেমন চলেনি। I admire Anil Da. He was unique in his own way এবং পেশাগত যোগাযোগের বাইরে মানুষের যে একটা অন্য আত্মিক বা সামাজিক পরিচয় থাকে , সেখানেও অনিলদা আমার প্রণম্য। মানুষ হিসেবে অনিলদার মহানুভবতার একটি বিশেষ ঘটনা আজও আমার মাঝে মাঝেই মনে পড়ে , আর ভেবে ওরকম মানুষের প্রতি অনায়াসেই শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। যে বছর 'এন্টনী ফিরিঙ্গী' মুক্তি পেল , সে বছরই 'বসন্ত বন্দনা' র রেকর্ডের জন্য আমি একটা গান করেছিলাম -''এ কী অপূর্ব প্রেম দিলে বিধাতা আমায়।'' এই রেকর্ডটা রিলিজ হওয়ার কয়েকদিন পর হঠাৎ একদিন সকাল বেলায় দেখি আমার বাড়ীর দরজায় কড়া নেড়ে উনি

দাঁড়িয়ে। ভেতরে ঢুকেই আমাকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ,-' কি সব অসাধারণ সুর করেছো, আহাঃ! ভাটিয়ার রাগটাকে এমন করে ব্যবহার করার কথা আমি তো ভাবতেই পারিনা। বেঁচে থাকো,-এমন আরও অনেক কাজ করো।' ওরকম গুণীলোকের মুখে ওরকম কথা শুনে আমার চোখে সেদিন জল এসে গিয়েছিল। - এই না হলে শিল্পী ! একটা গানের সুর ভাল লেগেছে বলে বরাহনগর থেকে এত মাইল ঠেঙিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে আসা , সঙ্গীত প্রেমটা কোন পর্যায়ে পৌঁছলে এটা সম্ভব, ভাবা যায় ! অনিলদার ছেলে অধীর বাগচীর সাথেও আমার সেই 'এন্টনী ফিরিঙ্গী'র সময় থেকেই পরিচয়। ঐ ছবিতেই আমার সাথে ও একটি ডুয়েটও গেয়েছিল। তখন তো ও খুবই young। পরবর্ত্তীতে ওর সুরে ' সমাধান' , 'দুই পুরুষ' এরকম কিছু কিছু ছবিতেও আমি গেয়েছি এবং ভালোও লেগেছে। ওর সুরে গাওয়া '' বেহাগ যদি না হয় রাজী , বসন্ত যদি না আজ আসে''গানটি তো একসময় খুবই popular হয়েছিল।

ফিল্মীগানের পথ বেয়ে বাংলা গানের জগতে আমার প্রাথমিক প্রবেশ তথা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংগীত পরিচালকদের অবদানের ধারাবাহিকতায় সুধীন দাশগুপ্ত এবং অনিল বাগচীর পরই নাম করতে হয় সুরকার নচিকেতা ঘোষের। সুধীনবাবুর সুরে ''শঙ্খবেলা'' , অনিলদার সুরে 'এন্টনী ফিরিঙ্গী' এবং মানবেন্দ্র মুখার্জীর সুরে 'মুখুজ্জ্যে পরিবার' ইত্যাদি ছবিতে পর পর কয়েক বছর গান গাওয়ার পর বাংলা চিত্রগীতির জগতে আমি যখন পায়ের নীচে খানিকটা ভূমি খুঁজে পেয়েছি, ভূমিহীন বনাম ভূস্বামীদের অস্তিত্বের লড়াই নিয়ে সারা পশ্চিম বাংলা তখন উত্তাল। আজ এখানে জোতদার খতম হচ্ছে , তো কাল ওখানে একদল নক্সাল গুলিবিদ্ধ হয়ে গেল। আজ এখানে বোমাবাজী হ'ল ,তো কাল ওখানে বোমাবাজের বোবা বোনকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ , নেতাজীর বাংলার তখন সে এক ভীষণ দুঃসময়। যাই হোক , পশ্চিমবাংলার ওরকম একটা ভীষণ দুঃসময়েই 'চিরদিনের' ছবির মাধ্যমে নচিবাবুর সাথে আমার প্রথম পরিচয়। এই ছবিতেও উত্তমকুমারের লিপেই আমাকে দিয়ে নচিবাবু তখন অনেকগুলো গান করিয়ে ছিলেন , যার মধ্যে''মানুষ খুন হলে পরে মানুষ তার বিচার করে '', এবং''ফুলপাখী বন্ধু আমার ছিল''তখন খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। 'চিরদিনের' পর 'ছুটির ফাঁদে', ' স্ত্রী ', 'সন্ন্যাসী রাজা ',নিশিপদ্ম'এরকম বহু ছবিতেই নচিবাবুর সুরে আমি এমন অজস্র জনপ্রিয় গান গেয়েছি। আমার আজকের এই যা কিছু প্রতিষ্ঠা , যা কিছু প্রশংসার্হ , সেক্ষেত্রে এসব গানের ভূমিকাও নিঃসন্দেহে অপরিসীম। ' নিশিপদ্ম' র কথা বলতেই মনে পড়ে গেল ঐ ছবিতে আমার গাওয়া - '' না না না আজ রাতে আর যাত্রা শুনতে যাবো না'' গানটার কথা। গানটাতো আসলে আমার গাইবার কোন কথাই ছিল না। ওটা গাইবার কথা ছিল শচীনদার। তা- ও ঐ ছবিতে নয় , ঐ বছরের পূজো সংখ্যার রেকর্ডে। কিন্তু কোন টেকনিক্যাল কারণে গৌরীবাবুর লেখা

এই গানটা সে বছর শচীনদা গাননি বলেই ঘটনা চক্রে ওটা শচীনদার পূজো সংখ্যা থেকে সোজা এসে গিয়েছিল একেবারে নিশিপদ্মর সেলুলয়েডে।

মানুষ হিসেবে নচিবাবু ছিলেন যথার্থ্যই colourful । ছিলেন তো আসলে ডাক্তার। কিন্তু ওটা আসলে ঐ পরীক্ষা দিয়ে পাশ করা পর্যন্তই। চিকিৎসা বোধ হয় তেমন ভাবে কোনদিনই করেননি। কুইনিন- এন্ট্রোকুইনল ছেড়ে অচিরেই চলে এসেছিলেন সংগীতের দিকে। প্রথমে উনি ছিলেন মূলত গাইয়ে। গানের রেকর্ডও বের হয়েছিল। কিন্তু পরে গায়ন ছেড়ে সংগীত পরিচালনার দিকেই পাকাপাকিভাবে চলে আসেন। নচিবাবুরও সুরকরার একটা স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য ছিল। আমাদের হিন্দী ফিল্ডের সংগীতকারদের সুর করার যে বিশাল ব্যাপ্তি, সেগুলো উনি খুব মাইনুটলি শুনতেন এবং আমাদের যে শাস্ত্রীয় সংগীত,লোক সংগীত , এই সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে উনি নিজের মতো করে খুব সুন্দরভাবে ভাবতে পারতেন , and practically it was rewarding too . ওঁর ছেলে 'খোকা' মানে সুপর্ণকান্তি ঘোষও খুবই প্রমিসিং ট্যালেন্ট। গত পনের বছরে ওর সুরেও এপর্যন্ত আমি বহু গানই গেয়েছি এবং এও লক্ষ্য করেছি যে নচিবাবুর মতো ওঁর ছেলে খোকাও আমায় খুব ভালো বুঝতে পারে এবং সেই মতোই সুর করার চেষ্টাও করে। বয়সের দিক থেকে আমাদের চেয়ে অনেক ছোট হলেও এই বয়সেই একটা গানকে বোঝবার , ভাববার ক্ষমতাটা ওর খুবই ভালো। আমার মনে আছে বছর কয়েক আগে পুলকবাবু যখন ঐ " সে আমার ছোট বোন " গানটা লিখলেন , গানটা দেখেই প্রথমেই আমার খোকার কথা মাথায় এসেছিল । শুনে পুলকবাবু বললেন , " না না মান্না দা' খোকা এখনও নিতান্তই ছেলেমানুষ। এরকম একটা সিরিয়াস গান , ওর জন্য একটু মুশ্কিলই হয়ে যাবে।" ওর খুব ভয় হচ্ছিল যে ওরকম একটা sensitive গান পোলাপানের হাতে পড়ে শেষপর্যন্ত না নষ্ট হয়ে যায়, গানটার প্রতি অবিচার না হয়ে যায় । কিন্তু শেষপর্যন্ত খোকাই ঐ গান বানালো এবং কতটা যে হৃদয় ছোঁয়া সুর করেছিল , সে বোধ হয় নতুন করে আর বলবার অপেক্ষাই রাখে না। ওর সুরে বহু গানই আমি গেয়েছি ,কিন্তু সব গানকে ছাপিয়ে "সারাজীবনের গান"," খেলা ফুটবল খেলা ", "কফি হাউসের সেই আড্ডাটা ", "দশবছরের বংশী" এরকম ব্যালাডধর্মী গানগুলোতেই খোকা যেন অধিক সার্থকতর ।

বাংলা চিত্রগীতির জগতে আমার এন্ট্রান্স এবং সেই এন্ট্রান্সের পথ ধরে শ্রোতাদের সাথে আমার আজকের এই এত ঘনিষ্ঠ মেল বন্ধনের এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত হাল- হকিকৎ। বাংলা ফিল্মী সংগীতের জগতে আমার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যদিও এই তিনজন সংগীতকারের কাছেই আমি বিশেষভাবে আমি ঋণী। কিন্তু পাশাপাশি একথাও বিশেষভাবেই উল্লেখনীয় যে, এনারা ছাড়া হেমন্ত মুখার্জী , সতীনাথ মুখার্জী , অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়,গোপেন মল্লিক,কালীপদ সেন, নীতা সেন,মৃণাল ব্যানার্জী , অজয় দাস প্রমুখ কলকাতার প্রায় সমস্ত গুণী সংগীত পরিচালকই পরবর্ত্তী

Deba Prasad Das

এই প্রায় পঁচিশ তিরিশ বছরে আমাকে দিয়ে বহু ছবিতে অজস্র সব ভালো ভালো গান গাইয়েছেন , যেগুলো জনপ্রিয়তাতো পেয়েছেই এবং পাশাপাশি তিল তিল করে আমাকেও জনপ্রিয় তথা প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছে। এদের প্রত্যেকের কাছেই আমি কমবেশী ঋণী।

আমি সব সময়েই চেষ্টা করেছি গান বাজনায় বৈচিত্র্য আনতে। এমনকি ফাংশনে পর্যন্ত কোনদিনই আমি পরপর দুটো একই রকম গান গেয়েছি বলেও মনে পড়ে না। যে কারণেই কী হিন্দী,কী বাংলা,সর্বত্রই বিভিন্ন সুরকারের সুরে গান গাওয়ার জন্য আমার মনটা যেমন সব সময়ই উন্মুখ হয়ে থাকতো , তেমনি কোন সুরকার যেভাবে সুর করেছেন , যেভাবে কোন গানকে উনি আমার থেকে নিতে চেয়েছেন , always I tried my best to satisfy him , to fulfil his dream , his way of imagination, যেকারণেই as per demand of the situation" সীতাকে কামড়ালো কালো কুকুরে" থেকে শুরু করে ' খট্ খট্ খুট খুট ঝট পট ফুট মুট', "আমাদের কাছা চাই,কোঁচা চাই,মুড়িঘন্ট মোচা চাই ", 'বাজেগো বীণা তুম না না নানা নানা ' ইত্যাদি যত বিচিত্র রসের গান করার অফার আমি পেয়েছি , তাতে কতটা কী success হয়েছি জানি না , কিন্তু সবসময়ই চেষ্টা করেছি সংগীতকারের দাবীমতো গানটাকে সেই আকাঙ্খিত পর্যায়ে পৌছে দিতে। যখনি কোন কঠিন গান গাইবার , uncommon গান গাইবার offer এসেছে , আমার কাছে বরাবরই সেটা একটা challenge হয়ে গেছে যে - "পারতেই হবে"। আমি খুব strictly ই বিশ্বাস করি যে, আমরা যারা professional playback singer, তাদের সমস্ত রকম গান-বাজনা শোনা উচিৎ এবং সমস্ত রকম গান গাইতে পারার প্রস্তুতিও অবশ্যই থাকা উচিৎ। আমাদের মনে রাখা দরকার যে আমাদের জন্য ছবির situation নয় , সিচুয়েশনের জন্যই আমাদের কদর , আমাদের অস্তিত্ব। সেক্ষেত্রে যারা মুঠোমুঠো টাকা খরচ করে এই সব বাণিজ্যিক ছবি বানায়, তারা যদি সিচুয়েশনের যথার্থ চাহিদা অনুযায়ী ছবিতে ছাগলের লিপেও গান ঢোকাতে চান, একজন professional singer হিসেবে সেই গান গাইবার জন্যও আমাদের মানসিক প্রস্তুতি থাকা দরকার। আর তা যদি না পারি , তবে রবাহুতের মতো ইন্ডাস্ট্রীতে ভীড় বাড়ানোর আমি একেবারেই পক্ষপাতী নই। অথচ খুবই দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা অপ্রিয় সত্য যে আজকাল কী বম্বে ,কী কলকাতা সর্বত্রই ইন্ডাস্ট্রীতে এরকম রবাহুত শিল্পী এবং সুরকারদেরই যেন বাড়-বাড়ন্ত। যেখানে একদিন রাইচাঁদ বড়াল , অনুপম ঘটক , পঙ্কজ মল্লিক , রবীন চট্টোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী প্রমুখের মতো দিকপাল ব্যক্তিত্বরা কাজ করে গেছেন, ভাবলে অবাক লাগে ইন্ডাস্ট্রীর সেই একই roomএ আজকাল এমন সব selfmade music directorরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন , music এর basic জিনিসগুলো পর্যন্ত যাদের জানা নেই। বছর চারেক আগে এই কলকাতাতেই এরকমই এক ভুঁইফোঁড় সংগীত পরিচালকের পাল্লায় আমি প্রায় পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিলাম।

Deba Prasad Das

আমি ভদ্রলোককে ঠিক চিনতাম না , ভদ্রলোকই প্রথমে আমাকে টেলিফোনে জানালেন যে উনি একটি ছবিতে সংগীত পরিচালনা করছেন এবং তাতে আমাকে দিয়ে কিছু গান গাওয়াতে চান। আমি একটা সময় ঠিক করে নিয়ে বল্লাম যে আপনি কাল অমুক সময় বাড়ীতে আসুন। আমি বাড়ীতেই থাকবো। তখনই গানগুলো নিয়ে বসা যাবে। পরদিন, আমাদের যেটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে , সেইমতো প্রায় ঘন্টাখানেক দেরীতে ভদ্রলোক আমার কাছে এলেন। তবে একা নয় , সঙ্গে একজন সাথীও এলেন। প্রাথমিক কথাবার্ত্তার পর বল্লাম যে ঠিক আছে আলাপ পরিচয় তো সব হ'ল , এবার আপনি গানগুলো একটু শোনান। আমার কথা শুনে ভদ্রলোক ওনার সাথীকে বল্লেন - " মান্নাদা গানগুলো শুনতে চাচ্ছেন , আপনি মান্নাদাকে গানগুলো একটু শুনিয়ে দিন। "আমি বল্লাম -" সে কী ! সংগীত পরিচালক আপনি। আর গান শোনাবেন আপনার বন্ধু ! এটা আবার কী ব্যাপার !! সংগীত পরিচালক কে ? আপনি না আপনার বন্ধু ?" এবার আমার প্রশ্নের জবাবে ভদ্রলোক যা বল্লেন , শুনে আমারতো একেবারে আক্কেল গুড়ুম ! বল্লেন ,- " আমিই সংগীত পরিচালক , এ আমার সহকারী। সুরটা আমিই করি। কিন্তু আমি হারমোনিয়াম বাজাতে পারি না। গানের গলাও নাই , তাই আমার assistant হিসেবে উনিই আপনাকে গানগুলো শোনাবেন। আমরা এভাবেই সুর করে থাকি।" শুনে ভদ্রলোকের উপর আমার এত রাগ হ'ল যে, প্রায় মুখের ওপরই সেদিন বলে দিতে ইচ্ছে করছিল ,- " আপনাদের মতো লোকেরা গান বাজনার জগৎ থেকে যত দূরে থাকবেন , আমাদের সুস্থ গান বাজনার জন্য সেটা ততই মঙ্গল।"